দুর্গা বাঙালি হলেন কী ভাবে

জহর সরকার

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বাঙালি জানে কি, দুর্গা মনেপ্রাণে কতটা বাঙালি? বাঙালির ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে, চার দেবদেবীর বয়স যারপরনাই কমিয়ে, তাঁদের দুর্গার সন্তান করা হয়েছিল। জহর সরকার

দুর্গাকে সব বাঙালিই খুব ভালোবাসেন। কিন্তু দুর্গাঠাকুর যে নিজেও মনেপ্রাণে কতখানি বাঙালি, সে বিষয়ে তাঁদের অনেকেই অবহিত নন। চেহারায়, কাজকর্মে এবং লোককাহিনিতে বঙ্গভূমির দুর্গা-মা বাকি দেশের থেকে একেবারে আলাদা। প্রথমত, শরৎকালে ভারতবর্ষের আর কোথাও কখনওই পরিবারের সব্বাইকে নিয়ে তিনি এরকম ঢাকঢোল পিটিয়ে আসেন না। দ্বিতীয়ত, অন্য কোনও প্রদেশে তাঁকে এমন আবেগে ভেসে স্বাগতও জানানো হয় না। এখানে তাঁর এমন কদর যেন তিনি একলা মেনকারই কন্যা নন, সমগ্র জনগোষ্ঠীরই আদরের মেয়েটি। এই হেঁয়ালি বুঝতে হলে, দেবীর দ্বান্দ্বিক চরিত্রের মূল সূত্রটি বোঝা দরকার। জানা দরকার, এক দয়াময়ী জননী কেন নিজের মায়ের কাছে এমন যুদ্ধং দেহি মূর্তিতে এসে দাঁড়ান! কিংবা, মা যখন অসুররাজের সঙ্গে জীবনমরণ যুদ্ধ করছেন, তখন তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরাই বা কোন আক্কেলে এমন নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকেন!

ইতিহাস বলছে, বাংলায় মহা আড়ম্বরের সঙ্গে দুর্গাপূজা শুরু হয় মধ্যযুগে। তখন রাঢ়বঙ্গে দেখা দিয়েছেন বাংলার জমিদারদের প্রথম গোষ্ঠী। তাঁদের নিয়োগ করেছিলেন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির। এই জমিদাররা ও জাহাঙ্গিরের সুবেদাররাই জাঁকজমকের দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। এঁদের মধ্যে তাহেরপুরের কংসনারায়ণ এবং নদিয়ার ভবানন্দ মজুমদারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। দুজনেই ব্রাহ্মণ। এ হল সতেরো শতকের দ্বিতীয় দশকের কাহিনি। এই যুগের প্রাচীনতম পূজাটি যদি টিকে যেত, তবে এখন তার বয়স দাঁড়াত বড়জোর চারশো বছর। জাহাঙ্গির-শাহজাহানের পর হিন্দু অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষক রূপে যে মুসলিম শাসকের নাম

পাওয়া যায়, তিনি হলেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। তিনি এবং তাঁর উত্তরাধিকারী বৃন্দ খাজনা আদায়ের জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উপরই আস্থা রেখেছিলেন। তবে, সে হল আঠেরো শতকের গোড়ার কথা। তার কিছু দিন পরই পলাশির যুদ্ধে সিরাজের সূর্য ডুবল এবং ভূস্বামীরা দলে দলে পক্ষ বদল করে ব্রিটিশের পতাকাতলে আশ্রয় নিলেন। এতটাই আনুগত্য তাঁদের যে মাত্র তিন মাস পরেই বিশ্বাসঘাতক ক্লাইভের বিজয় উদ্‌যাপনে রাজা নবকৃষ্ণ দেব প্রবল ধুমধামে দুর্গাপূজা আয়োজন করলেন। তাতে নর্তকীর আসর বসেছিল, সুরার স্রোত বয়েছিল।

মোদ্দা কথা হল— বাদশা, নবাব কিংবা ব্রিটিশ, তিন শাসকেরই এক রা। যে কোনও মূল্যে চাষযোগ্য জমির বিস্তার করতে হবে। আর জন্য বিস্তীর্ণ জলাজমি থেকে সেখানকার অধিবাসী বেচারা মহিষদের তাড়াতে হবে, কারণ সেই জমিতেই তো বুনতে হবে সেরা জাতের আমন ধান। এই প্রয়োজন থেকেই, দেবীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে কৃতকর্ম আড়াল করার অভিপ্রায়ে, দুর্গার মহিষ বধের আয়োজন। এ বার বোঝা যাচ্ছে, কেন রক্তাক্ত অবলা জীবটিকে দেবী খামকা টেনেহিঁচড়ে তাঁর বাপের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এলেন! অন্য দিকে, পুরাণে অশুভ শক্তির সঙ্গে দেবীর যে অক্লান্ত সংগ্রাম বর্ণিত, তার উপরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রগাঢ় আস্থা। তাই তাঁকে সেই চিরাচরিত রূপে বর্ম এঁটে যোদ্ধৃবেশে দেখা দিতে হল। একেবারে রণসাজে, দশভুজে। চার দিনের বার্ষিক পূজাবকাশেও তাঁর যুদ্ধের ছুটি নেই। তার ওপর, কৃষকরা অতি চঞ্চলমতি। যদি জমিদারের শর্তে তাঁদের নাভিশ্বাস ওঠে কিংবা ক্রমাগত দুর্ভিক্ষে তাঁদের অন্ন না জোটে, তবে তাঁরা জমিদারি ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধতে পারেন। তাই তাঁদের উপর কর্তৃত্ব কায়েম রাখতে অপরাজেয় পরাক্রম প্রদর্শনের স্বার্থে জমিদাররা দুর্গাশক্তির ওজর নিলেন।

এই সব স্ববিরোধিতা লক্ষ করেছেন উনিশ শতকের কবি দাশরথি রায়। তাঁর আগমনী পদে মেনকা প্রায় শিউরে উঠেছেন,

‘কে হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী/সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী?’

রসিকচন্দ্র রায়ের পদেও মেনকার অনুরূপ মনোভাব:

‘ গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপুরে/
এ তো সে উমা নয়— ভয়ঙ্করী হে, দশভুজা মেয়ে’।

বাঙালি দুর্গার আরও একটি দায় ছিল। তাঁকে সুখী ‘পরিবার’-এর মমতাময়ী ‘মা’রূপে দেখতে সাধারণ মানুষ বড়ই আগ্রহী। ঘটনাচক্রে, তত দিনে কার্তিক ও গণেশ একক ঈশ্বর রূপে পূজিত হচ্ছেন। অনার্য সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ইতিহাস বহুধা বিবর্তনের পর তাঁদের এহেন উত্থান। দ্রাবিড়দের মধ্যে বহু দিন যাবৎ মুরুগন, অরুমগম, সেন্থিল বা সুব্রহ্মণ্য নামের দেবপূজার চল রয়েছে। এখানে ভগবান প্রাক্-বয়ঃসন্ধি বালক-দেবতা রূপে পূজিত। তিনি সুকুমার। তাঁর প্রাপ্তযৌবন পুরুষকারে চরাচর কাঁপে না। গণেশ ঠাকুরটিও খাঁটি দেশি। তিনি হলেন গণ-ঈশ— পুরাণে কদাকার খর্বকায় যে ‘গণ’দের উল্লেখ মেলে, তাঁদের দেবতা। ‘স্কন্দপুরাণ ’ও ‘শিবপুরাণ’-এ উভয়কেই দুর্গা-তনয়ে পর্যবসিত করা হল। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার পূজাবেদীতে দেবীপার্শ্বে ‘অতিথি শিল্পী’র ভূমিকায় তাঁরা প্রথম অবতীর্ণ হন। রাজশাহির নওগাঁও ও কুমিল্লার দক্ষিণ মোহাম্মদপুরে সেই সময়ের যে বিগ্রহ উদ্ধার হয়েছে, সেখানে এই সাক্ষ্য মিলেছে। বরং লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিষয়টি অধিক গোলমেলে। কারণ, বিষ্ণুর সহচরী রূপে যে শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীকে আমরা চিনি, তিনি তো বয়সে দুর্গার থেকে বড়! অন্য দিকে সরস্বতীও আগেই ব্রহ্মার সঙ্গিনী রূপে সুপরিচিতা। তবু, বাঙালি জনসাধারণের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে এই চার জনেরই বয়স যারপরনাই কমিয়ে, তাঁদের দুর্গার সন্তানসন্ততি রূপে প্রতিষ্ঠা করা হল। এমনকি, বিধিসম্মত কোনও দত্তক শংসাপত্রেরও দরকার হল না। পিতৃতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যেন তাতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। যে কোনো প্রকারেই হোক, এই যুদ্ধং দেহি চণ্ডীমূর্তিকে নিয়ন্ত্রণে তো আনা গেল! নইলে এই উগ্রস্বভাবা নারীত্বের স্বাধীনতা নিয়ে মেয়েদের বিপজ্জনক সব দীক্ষা দিয়ে না-জানি কতই বিপদে ফেলতেন। তাঁকে চার ছেলেমেয়ের স্নেহপাশে বেঁধে ‘ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে’ যেন শান্তি! বিপত্তারিণী বলে দাগিয়েই বিপদ হতে রক্ষা! এ বার বোঝা গেল, কেন তাঁর সন্তানকুল সমরাঙ্গন এড়িয়ে অন্য দিকে দেখছেন? উপায়ই বা কী? মধ্যযুগের শেষার্ধে চার সন্তানের জন্য নতুন করে পুরাণের গল্প ফেঁদে, রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্রে অসুরদলনে তাঁদের ভূমিকায় সিলমোহর দেওয়া তো সম্ভব ছিল না আর!

ভেবে দেখুন, সারা ভারতে শরতের এই নয়টি দিন পালিত হয় নবরাত্রি রূপে। দুর্গার নয়, রাম-রাবণের যুদ্ধের স্মারক এই নবরাত্রি। এ সময় ভক্তরা সংযম, উপবাস পালন করেন, মিতাহার অভ্যাস করেন। কিন্তু বাঙালিরা তো সর্বদাই উলটো পথে চলেন। তাই তাঁরা এই আনন্দের দিনগুলি উদ্‌যাপন করেন চর্ব্যচোষ্য সহযোগে। বাঙালির উদ্যোগী কবি কৃত্তিবাস ওঝার কল্যাণেই অবশেষে বাঙালির দুর্গাপূজায় রামায়ণ প্রসঙ্গটি জোড়া হয়। যদিও দশেরার দিন সারা ভারত যখন রামের রাবণজয়ের আনন্দে মাতে, তখন বাঙালিরা মা দুর্গার অসুরসংহারের অন্তিম বিজয়ের স্মৃতি উদ্‌যাপন করেন। তবে, বাঙালির মনে সে দিন বিষাদের ঘনঘটা। সে তিথিতে যে তাঁদের ঘরের মেয়ে দুর্গার সপরিবারে সাশ্রুনয়নে বিদায় নেওয়ার পালা। গণেশের কলাবৌ স্নান দিয়ে যে উর্বরতার উৎসবের সূচনা, এই দিন সিঁদুর খেলায় তারও সমাপন। অবশ্য সিঁদুর খেলা এখন আধুনিক বঙ্গবালার অঙ্গরাগ তথা স্টাইলের বিশেষ দ্যোতক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিংহরাজের স্থানমহিমাটি ব্যাখ্যান না করলে এ গাথা অসমাপ্ত থেকে যাবে। সর্বভারতীয় চালচিত্রে চেনা ছবিটি হল, মা দুর্গা ব্যাঘ্রবাহিনী। কিন্তু বাংলার নতুন জমিদারকুল বাঘের বদলে পশুরাজ সিংহকে দুর্গার ভারবহনে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ, সিংহ অসীম শক্তির প্রতীক। গোল বাধল অন্য জায়গায়। সিংহভাগ বাঙালিই তো কখনও সিংহ চাক্ষুষ করেননি। তাই ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজাসনগুলিতে দেবীর বাহন হিসেবে দেখা যেত ঘোড়ার মতো বা অনুরূপ কোনও একটি প্রাণীকে। বাংলার মৃৎশিল্পীরা ঠিকঠাক সিংহ গড়তে শুরু করলেন উনিশ শতকের শেষে, কারণ তখনই কলকাতার চিড়িয়াখানায় প্রথম দুটি সিংহ আমদানি হয়।

এর পরে পরেই, পুজোর উদ্যোক্তার ভূমিকায় জমিদারদের জায়গায় এলেন জাতীয়তাবাদীরা। তাঁরা সমষ্টিগত ভাবে সর্বজনীন পূজা শুরু করলেন। তাঁদের জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডে মানুষ যাতে শামিল হন, তার জন্য এই মঞ্চকে একটি মাধ্যম রূপে ব্যবহারের কথা ভাবলেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁদের পূজাবাসরে সকলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করলেন। দুর্গোৎসবের এই ‘বারোয়ারি ’পর্যায়টি আজও

চলছে। শুধু কর্মকর্তারাই কেবল বদলে যাচ্ছেন। জমিদারপ্রভুরদের নাটমণ্ডপ ছেড়ে, মধ্যবিত্ত নব্য বুর্জোয়ার উঠোন ঘুরে, আজেকর দুর্গাপুজোর রঙিন শামিয়ানাটি টাঙানো চলছে মহার্ঘ আবাসনগুলির সাজানো বাগানে। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, প্রতিপত্তিশালী পেশাদার এবং ব্যবসায়ীরা এই সব অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা। তাঁরা সমাজের মূলস্রোতটি থেকে একটু বিচ্ছিন্ন থাকতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। দুর্গাপূজা এখন বহুলাংশেই তাঁদের সামাজিক মেলামেশার বার্ষিক ঠিকানা। আর এই একুশ শতকে এসে অবশেষে দুর্গাপূজার একচেটিয়া দখল নিয়েছেন সাবঅলটার্ন শ্রেণি, যে শ্রেণি এখন রাজনৈতিক ক্ষমতার গদিতে অধিষ্ঠিত।